ইচ্ছাবাড়ি অনেক দূর

সাত ফুট বাই সাড়ে চার ফুটের ঘরটাতে বসে একমনে মেশিন চালাচ্ছিল লক্ষ্মণ জানা। পাশের ছোটা চৌকিতে স্তূপাকার করা ছোটো ছোটো জামা প্যান্ট। লাল - হলুদ-নীল সবুজ- সব উজ্জ্বল রঙের। লক্ষণের এই ঘরের বিবর্ণ দেওয়ালের সঙ্গে বড়ো বেমানান এই রঙগুলো।

ক্ষির...ক্ষির... শব্দে চলতেই থাকে সেলাই মেশিনটা। মেশিন চালাতে চালাতেই এক বার হাত তুলল লক্ষ্মণ; সামান্য পরে আরও একটা। কেমন যেন একটা ঢুলুনি আসছে। ঘুম ঘুম ভাব।

আজ ভোররাতেই ঘুম ঙেভে যায় ওর। মাঝরাতেও এক বার ছেদ পড়েছিল ঘুমের। উঠে জল খেয়েছিল। বাইরে যাওয়ার একটা তাগিদও ছিল। কিন্তু ভোরের ঘুম ভাঙার পিছনে সেরকম কোনো কারণ ছিল না। হঠাৎই ঘুমটা ঙেভে যায়। আর তারপরেই সেই চিন্তাটা ফিরে আসে মনে। গত কয়েক দিনেও বেশ কয়েক বার এরকম হয়েছে। 'হ্যা' অথবা 'না'-এ পৌঁছতে গিয়ে বার বার হোঁচট খেতে হচ্ছে।

মিনতি তখন পল্টু আর টুসিকে নিয়ে পাশের ঘরে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ছেঁড়া কম্বলটা ভালো করে টেনে নিয়ে পাশ ফিরে শুয়েছিল লক্ষ্মণ। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ঘুমটা আর ফিরে আসেনি। কয়েক বার এপাশ ওপাশ করে চৌকি থেকে নেমেছিল। বাইরে বেরিয়েছিল চাদরমুড়ি দিয়ে। পূবের আকাশে লালের ছটা লাগার তখনও কিছুটা দেরি; তবে একটা কাক ডাকছিল। মিনিট তিনেকের মধ্যেই ঘরে ফিরেছিল লক্ষ্মণ। কম্বলের নীচে সেঁধিয়ে যাবার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঘুম এসেছিল দু-চোখের পাতায়।

যখন ঘুম ভাঙল তখন কুয়াশার পর্দা সরিয়ে টালির ফাঁক দিয়ে আলোর একটা - দুটো বিন্দু ঢুকে পড়েছে ঘরের মধ্যে। হঠাৎ ভাঙা ঘুমের অস্বস্তি নিয়ে ধড়ফড় করে বিছানা ছেড়ে নেমেছিল লক্ষ্মণ। এখনও যে বেশ কয়েক ডজন মাল সেলাই করা বাকি—এই ভাবনা থেকেই কোনোরকমে এক কাপ চা শেষ করে মেশিনে বসেইকালকেই এনায়েৎ আলি তাগাদা দিয়েছিল; বলেছিল, অনেক কাজ বাকি আছে। একটু হাত চালাস লক্ষ্মণ, বউকে বলিস।

লক্ষ্মণ বলেছিল মিনতিকে। তবে ও জানে, না বললেও কিছু অসুবিধা হত না। দায়িত্ববোধ ওর চাইতে মিনতির কোনো অংশে কম নয়।

আবার একটা হাই তুলল লক্ষ্মণ। হাতের জামাটা সেলাই করে মেশিন ছেড়ে উঠল। একটু সময় নিয়ে আড় ভাঙল। শীতের রোদে আজ তেমন তেজ নেই। মেঘের দাপটে ছায়া নেমে আসছে বার বার।

ঘর থেকে বেরিয়ে লক্ষ্মণ পাশের ঘরে গেল। মিনতি তখন বারান্দার এককোণে পাতা - উনুনে ডাল সাঁতলাতে ব্যস্ত। আপাত বড়ো এই ঘরটার একপাশে টুসি ছোটো জামাগুলোকে পাটে পাটে গোছ করেছিল। সেভেনে পড়া মেয়েটার হাত এই ধরণের পেশাদারি কাজে যতটা চলার কথা তার চাইতে জোরেই চলে। ছোটোবেলা থেকেই জামা ভাঁজ করার নিখুঁত কৌশল মেয়েটা রপ্ত করেছে।

একদিন খেতে খেতে মিনতিকে এ - কথাটা বলেছিল লক্ষ্মণ। মিনতি বলেছিল। দর্জি ঘরের মেয়ে অভ্যাস তো করতেই হবে।

'দর্জি' শব্দটা কানে থেমে গিয়েছিল লক্ষ্মণের। যদিও তাৎক্ষণিক কোনো জবাব দিতে পারেনি। তবে অনেক ভেবেছে, ঠিক করে থেকে সুতোকলের শ্রমিক লক্ষ্মণ দর্জি হয়ে উঠল।

মেয়ের দিকে তারিয়ে প্রশ্ন করল, দাদা কোথায় রে?

—ইস্কুলে গেছে।

লক্ষ্মণের দ্বিতীয় প্রশ্নের আগেই টুসি বলল, আজকেও যেতে চাইছিল না, মা মেরে পাঠিয়েছে।

এ ব্যাপারে আর কোনো প্রশ্ন করল না লক্ষ্মণ। তেল মেখে পুকুরে গেল। চান করে ফিরে শীতের আড়ষ্টতা কাটাতে রোদে গিয়ে দাঁড়াল। বিড়ি ধরাল একটা। দুটো টান মারার পরেই হারাধন এসে দাঁড়াল পাশে। লক্ষ্মণের কাছ থেকে বিড়িটা চেয়ে নিয়ে নিজের বিড়িটা ধরাল।

একটা টান মেরে বলল, কী ঠিক করলি লখু, ফিরেই যাবি গ্রামে?

উততর দেবার আগে একবার জোরে নিশ্বাস ছাড়ল লক্ষ্মণ। কিছুটা সময় নিয়ে বলল, এখনও কিছু ঠিক করিনি; ছেলেটাকে নিয়েই চিন্তা।

—কেন গ্রামে যেতে চাইছে না?

—না, তা নয়, তবে কখনও তো গিয়ে থাকেনি। তা ছাড়া কিছু করে খাওয়ার তো বন্দোবস্ত করতে হবে। পড়াশোনাতেও মন নেই।

পড়তে না চাইলে একটা কাজে লাগা। লেখাপড়া শিখেই-বা কী হবে! আমাদের মতো ঘরের ছেলেরা

কতই-বা লেখাপড়া শিখতে পারবে! তবু কোনো কাজ শিখলে পেটে-ভাতে টিকে যাবে।

—সেটাই ভাবছি। কথা শেষ করে বিড়িতে একটা টান মারল লক্ষ্মণ।

—দেখ লখু তুই কপাল করে ভাই পেয়েছিলিস; এত দিন কোনো যোগাযোগ রাখিসনি। কিন্তু তারা তো তোকে সবরকম ভাগই দিল। অতটা জমি দিল।

—হুঁ, আমি তো অস্বীকার করি না।

—তুই আর দেরি করিস না, হাতে যা কাজ আছে করে, ওস্তাগারের কাছ থেকে পাওনাগন্ডা বুঝে নিয়ে রওনা হ। চাষবাস করে তোর ছোটো সংসার ঠিক চালিয়ে নিতে পারবি।

—হ্যাঁ, দেখি।

—কী আর দেখবি, এখানে যেভাবে আমি তুই বেঁচে আছি সেটাকে কি বেঁচে থাকা বলে! এর লাথি খেয়ে, ওর লাথি খেয়ে কুত্তার মতো বাঁচা। তা ছাড়া তুই কি মনে করিস মিল আবার খুলবে! বাপের জন্মে ওই মিল খুলবে না।

—কথা তো মাঝেমধ্যেই শুনছি, যে খুলতে পারে।

—তুই থাম, ও সব শালা নেতাদের যত প্যাঁচ।

কোনো কথা বলল না লক্ষ্মণ। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। বিড়িটা শেষ হয়ে গিয়েছিল আগেই। সেটা ছুড়ে দিল দূরে।

মনের তাগিদ ছিল না; দুপুরে খাওয়ার পরে একপ্রকার জোর করেই লক্ষ্মণ নিজেকে মেশিনে গিয়ে বসাল। পাশের ঘরে মিনতিও ততক্ষণে মেশিন চালাতে শুরু করেছে।

সন্ধ্যের মুখে যখন মেশিন ছেড়ে উঠল তখন চৌকির উপর সেলাই করা রঙিন জামা-প্যান্টের একটা স্তূপ সৃষ্টি হয়েছে। আরও অনেক টা বাকি; সন্ধ্যের পর বাকি কাজের বেশিরভাগটাই সেরে ফেলবে— মনে মনে সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলল লক্ষ্মণ। চাদরে শরীরে ঢেকে বাইরে এসে দাঁড়াল। পাশের ঘরে মিনতি তখন তালায় তেল দিয়ে মুড়ি মাখতে ব্যস্ত। এক বাটি মুড়ি আর এক কাপ চা শেষ করে সন্ধ্যের পর মেশিনে বসার আগে বাকি কাজটা আর একবার দেখে নিল। কাজের সঙ্গে সুতোর হিসেবটা মিলিয়ে নিল মনে মনে। তারপর আবার মেশিন চালাতে শুরু করল।

মিনতি যখন খেতে ডাকল তখন ঘড়িতে দশটা বেজে গেছে। সব কাজ গুছিয়ে দরজা খুলে পাশের ঘরে যেতে গিয়ে লক্ষ্মণ বুঝল আজ ঠানা পড়েছে বেশ।

মেঝেতে বসে ভাত খেল কিছুটা আড়ষ্ট হয়েই। দ্বিতীয় বার এক হাত ভাত লক্ষ্মণের পাতে দিতে গিয়ে মিণতি বলল, আজ এত ঠান্ডা পড়েছে!

—কলকাতার মধ্যে হলেও আমাদের আলমপুর - পিরতলা ঠিক গ্রামেরই মতো, ঘুটঘুটে অন্ধকার, আমার বন্ধুরা তাই বলে। কথা শেষ করে টুসি মুখে ভাত তুলল। মুখের ভাতটা শেষ করে লক্ষ্মণ বলল, আলোর কাছে থাকতে গেলে টাকা লাগে রে, অনেক টাকা।

আলেটা কেঁপে উঠল দু-বার। তারপরেই নিবে গেল। চারপাশে এখন শুধুই লোডশেডিং -এর কালো রং। আধপোড়া মোমবাতির আলোতে বাকি খাওয়াটা কোনোরকমে শেষ করে উঠে দাঁড়াল লক্ষ্মণ। একে একে বাকি তিনজনও।

ইচ্ছা থাকলেও আর মেশিনে বসা হল না ওর। মিলের তিন - হাত দখল করা জায়গায় গড়ে তোলা ছোটো ঘরটায়, ছোট্ট চৌকিতে একাধিক তালি মারা কম্বলের নীচে নিজেকে মেলে দিল। কিন্তু ঘুম এলো না। হারাধনের কথাগুলো মনে পড়ছে, মনে পড়ছে কত বছর আগে দেখা ইচ্ছাবাড়ির কথা: প্রশস্ত উঠোন...উঠোনের কোণে উঁচু মাটির ঢিপির ওপর থেকে পায়রা ওড়ানো, হলুদ সরষে খেতের পাশ দিয়ে সাদা পায়রা ধরবার জন্য প্রায় দুই কিলোমিটার পথ ছুটে যাওয়া। অনাবিল সুখে মোড়া ছিল দিনগুলো। দু-বার ফেল করার পরও বাবা যাছনি লক্ষ্মণ কলকাতায় কাজ করতে যাক। লক্ষ্মণেরও ইচ্ছা হয়নি ইচ্ছাবাড়ি ছেড়ে আসতে। কিন্তু আসতে হয়েছিল। বড়োজ্যাঠা বাবাকে বুঝিয়েছিল গ্রামে বসে সময় নষ্ট না করে শহরে যাহোক একটা কাজে লাগলে ভবিষ্যতে দাঁড়াতে পারবে।

অনেক পরে গুমার ইটখোলায়, কিংবা তারাতলার সুতোকলে কাজ করার সময় ইচ্ছাবাড়ি গ্রামটা ওকে অতটা টানত না। মিনতিকে নিয়ে নতুন জীবনের স্পর্শে পুরোনো স্মৃতিগুলো যেন ফিকে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যখন মিল বন্ধ হল, চলতে থাকা জীবনটা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল তখন ভীষণ মনে পড়ত গ্রামের কথা, জন্মমাটি ইচ্ছাবাড়ির কথা।

কিন্তু ফিরে যাবার কোনো উপায় ছিল না। মিনতিকে মানতে পারেনি বাবা, বড়োজ্যাঠা। দরজা বন্ধই

হয়ে গিয়েছিল। লক্ষ্মণ কখনও এই নিয়ে অভিযোগ জানায়নি। বরং এক এক সময় মনে হয়েছে বাবা লোক ধরে সুতোকলে চাকরি করে দিয়ে তার কর্তব্য করেছিল, কিন্তু লক্ষ্মণই তার মর্যাদা দিতে পারেনি।

অনেক কথা, জীবনের অনেক ছবি ওর মাথায় এসে জড়ো হয়। একসময় ঘুম জড়িয়ে আসে চোখ দুটোতে।

দুই

মেশিনে বসতে মন লাগছিল না একেবারেই। হাতের কাজ অল্প থাকায় মেশিন চালানোটা যে খুব জরুরি ছিল তা-ও না। চৌকিতে বসে সামনে তাকিয়ে ছিল লক্ষ্মণ। শীতের রোদ মাখামাখি হয়ে আছে খোলা জায়গাটাতে। একটা কাঠবেড়ালি সামনে জামরুল গাছের ডাল বেয়ে সোজা ওপর দিকে উঠে গেল।

একটা বিড়ি ধরাল লক্ষ্মণ। বিড়িটা ঠোঁটে চেপে মেশিনের পাশে রাখা ছোটো খাতাটা টেনে নিয়ে হিসেব মেলাতে শুরু করল। ওস্তাগরের কাছ থেকে কত পাওনা, সুতোর দোকানে কত বাকি আছে। সব কিছু দেনাপাওনা মিটিয়ে দেখা গেল। সতেরোশো সত্তর টাকা হাতে আসবে ওর।

বিড়িটা শেষ হয়ে এসেছিল। শেষ টান মেরে অবশিষ্টটুকু জানালা দিয়ে ছুড়ে দিল দূরে।

পাশের ঘরে গিয়ে মিনতিকে জিজ্ঞাসা করল এই ক-দিন ওর কাজের হিসেবটা আরো বারোশো; উনত্রিশশো সত্তর। তার মানে প্রায় তিন হাজার। পাশের ঘরটা দিলুকে ছেড়ে দিলে ও যদি হাজার তিনেক টাকাও দেয় তাহলে সব মিলিয়ে ছয় হাজার। সম্ভাব্য আয়ের অঙ্গটা সহজে বেরিয়ে আসায় লক্ষণ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল।

মিনতিকে বলল, আমি এনায়েতের কাছ থেকে ঘুরে আসছি, ফেরার সময় বাজার হয়ে আসব।

এনায়েতের বাড়ি গিয়ে কথা বলে বুঝল, হাতে যে কাজ ছিল তা অনেকটাই শেষ হয়ে এসেছে। সামনে কোনো পরব নেই, তাই আবার একটা মন্দা আসবে। অন্য বারের মতো কাজ কমে যাওয়ার ব্যাপারটা এবার আর তেমন ভাবল না লক্ষ্মণকে।

আড়াইশো চুনো মাছ কিনে যখন বাড়িতে ঢুকল মিনতিতখন সদ্য সেলাই হওয়া লাল নীল হলুদ সবুজ জামাগুলো একটার ওপর একটা সাজিয়ে রাখছে। ঘাড় ঘুরিয়ে লক্ষ্মণকে দেখল মিনতি, কিন্তু গুনতিতে ভুল হওয়ার আশঙ্কায় কোনো প্রশ্ন করল না।

শীতের রোদে শরীর এলিয়ে সময় কাটাতে কাটাতে আর আধা অন্ধকার ঘুরে ঢুকে মেশিনে বসতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। বিকেলের মুখে যখন কাজে নিবিষ্ট হল ঠিক তখনই এলো মানিক মণ্ডল। সাইকেলটা জামরুল গাছে হেলান দিয়ে রেখে বলল, কি রে লক্ষ্মণ, অনেকদিন তোর কোনো খবর নেই!

—আসুন মানিকদা।

—এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই বাবলাম তোর সঙ্গে এক্কার দেখা করে যাই। কেমন আছিস? পান চিবোনোর গলায় প্রশ্ন করল মানিক মণ্ডল।

—আপনাদের আশীর্বাদে কেটে যাচ্ছে।

—কাজকাম সব ঠিকঠাক চলছে তো?

—ওই কোনোরকমে পেট চলে যায়।

—লড়াই তো করতেই হবে রে লক্ষ্মণ।

—চা খাবেন তো মানিকদা?

—তা একটু খেতে পারি। কথাটা শেষ করে জানলা দিয়ে পানের পিক ফেলল মানিক।

লক্ষ্মণ পাশের ঘরে গিয়ে মিনতিকে চায়ের কথা বলে দু-এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলো।

—আপনি কেমন আছেন মানিকদা?

—আছি একপ্রকার। ক্ষণিক চুপ থেকে মানিক বলল, হ্যাঁ রে লক্ষ্মণ তোর এই ঘরটা কোম্পানির জমির ওপর না।

—হ্যাঁ, তবে সবটা নয়। কিছুটা; বলল ভেঙে দেবে। আমি বললাম, আগে মিল খুলুক। পয়সাকড়ি পাই, আমি নিজেই ভেঙে দেব। কথাটা শেষ হলে লক্ষ্মমের কালো কষ্টিপাথরের মতো শরীরের সাদা দাঁতগুলোতে হাসি বুলিয়ে নিল মানিক।

—ঠিক বলেছিস। ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল মানিক।

—তবে আর বেশি দিন তো নয়, চলেই যাচ্ছি।

—কোথায় যাচ্ছিস?

—ইচ্ছাবাড়ি, আমার গ্রাম; পূর্ব মেদিনীপুর।

—বলিস কী রে! এতকাল কলকাতায় থাকলি, আর এখন এত দুর চলে যাবি!

—এখানে থেকে কী হবে মানিকদা!

—কী হবে মানে! খবর কি কিছুই রাখিস না; মিল আবার খুলছে।

কথার মাঝখানে চা নিয়ে ঘরে ঢুকল মিনতি। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে প্রথম চুমুক লাগাল মানিক। বিস্কুটটা চায়ে ডুবিয়ে একটা কামড় দিয়ে বলল, শোন লক্ষ্মণ, কর্তৃপক্ষ আার ইউনিয়নের সঙ্গে মিটিং -এ বসতে রাজি হযেছে। যা খব, তাতে ফল খারাপ হবে না।

দ্বিতীয় বার শব্দ করে চায়ের চুমুক দিলে মানিক। লক্ষ্মণও এক চুমুকে ওর কাপের বেশ কিছুটা চা কমিয়ে আনল।

—তা ছাড়া তোরা ছিলিস পার্টির অ্যাকটিভ মেম্বার। তোরাই তো অন্য শ্রমিকদের বোঝাবি।

—কত কথাই তো শুনছি মানিকদা। এক বার দু-বার তো নয়, খেপে খেপে কত বারই তো মিল বন্ধ হল। কখনও সেলাই -এর কাজ, কখনও চা গুদামের কাজ, এভাবে কি জীবন চলে!...নেহাত শ্বশুরবাড়িতে একটু জায়গা দিয়েছিল, তা না হলে হয়তো রাস্তায় বসতে হত।

—দেখ লক্ষ্মণ অত কিছু ভাবলে চলে না। এই সময় সংগঠন জোরদার করতে না পারলে, কোম্পানির কাছাকাছি না থাকলে পাওনা টাকা আদায় করতে পারবি ভেবেছিস!

—ওসব আর ভাবি না মানিকদা। ভাইরা ডেকে জমি দিচ্ছে, বলেছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গিয়ে সব বুঝে নিতে।

কাপের তলানিতে থাকা চা-টা এক চুমুকে শেষ করে কাপটা শব্দ করে পাশে রাখল মানিক মণ্ডল। লক্ষ্মণের দিকে তাকিয়ে বলল, সারাজীবন কারখানায় মেশিন চালিয়ে যে হাতে কড়া ফেলেছিস সেই হাতে খেতে গিয়ে ধান কাটতে পারবি? পারবি না লক্ষ্মণ, পারবি না;

একটু থেমে মানিক আবার শুরু করল, একটা জিনিস জানবি লক্ষ্মণ, শ্রমিক বেঁচে থাকে মেশিনের শব্দ বুকে নিয়ে, মিল বন্ধ হওয়ার পর এত দিন তুই বেঁচে আছিস কিন্তু মেশিন চালিয়েই। তা ছাড়া তোর ছেলেরাও তো একটা অধিকার আছে ওই মিলে। সেইটা তো তুই কেড়ে নিতে পারিস না।

লক্ষ্মণ কোনো কথা বলছিল না। জানলা দিয়ে তাকিয়েছিল দূরে। ওপাশের ঘরে দরজার কোণে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনছিল মিনতি।

—আমাদের পার্টির সংগঠনটা মাঝখানে আলগা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আবার আমাদের হাত শক্ত করতে হবে। নতুন করে গড়ে তোলার সময় হয়েছে; এই সময় তোদের খুব দরকার রে লক্ষ্মণ। অনেককে জড়ো না করলে কিছু করা যায় না, সে তো তোরা পার্টিতে ঢোকার পরেই বুঝেছিলিস।

কথা শেষ করে উঠে দাঁড়াল মানিক মণ্ডল, যাক গে, আজ চলি রে লক্ষ্মণ, আরও অনেকের কাছে যেতে হবে, আর একদিন অসব।

বাইরে আলো কমে গিয়ে আধো অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। কোনো ভূমিকা ছাড়াই বলল, মিল আবার খুলবে!

—খুলতে পারে, মানিকদা তো তাই বলল।

—টাকাপয়সা সব দিয়ে দেবে?

—দিতে পারে।

—তাহলে এখন না হয় নাই-বা গেলাম...। এখানেই...

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল মিনতি। কিন্তু লক্ষ্মণের হাবভাবে কোনো ভিন্নতা ফুটছে না দেখে চুপ করে গেল। একসময় বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বাইরে আর আলোর অবশিষ্টতা নেই। ঘরের ভিতর একরাশ অন্ধকার জমাট বেঁধেছে। মানিক মণ্ডল চলে গেছে অনেকক্ষণ। জানলার নাগাল এড়িয়ে লক্ষ্মণের দৃষ্টি দূরে—

পুকুরের ধার ঘেঁষে মিলের কোয়ার্টারগুলো ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে। আরও দূরে ওয়ার্কশপ; তার ভিতর মেশিন, সুতোর রিল, মানুষজনের কর্মমুখরতা। সেইসব চেনা সহকর্মীদের মুখ; মেশিনের ধাতব শব্দের সঙ্গে এগিয়ে চলা জীবনের এক একটা যন্ত্রময় দিন।

ইচ্ছাবাড়ির আমামী জীবন-পটভূমি পেরিয়ে লক্ষ্মণ পৌঁছে গেছে অতীতের কর্মচঞ্চল এক প্রেক্ষাপটে। একদিন যেখান থেকে শুরু করেছিল এক নতুন জীবন, আজ ফেলে আসা সেই জীবনের স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে ওর মন।